



আমরা যাদের উত্তরসূরী

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সাইবানী (রাহঃ)

পরিচয়ঃ মুহাম্মদ নাম, আবু আব্দুল্লাহ নামে প্রসিদ্ধ। পিতার নাম হাসান। ইনি বনু সাইবান গোত্রের গোলাম ছিলেন সেই জন্য তিনি 'সাইবানী' বলে পরিচিত হন। দামেশকের অদূরে 'হারাসূতা' নামে এক পল্লী ছিল। ইমাম মুহাম্মাদের পিতা এখানকারই অধিবাসী ছিলেন। ইনি ছিলেন সিরীয় বাহিনীর এক কর্মচারী। এই চাকুরী জীবনেই তাকে কিছুকাল “ওসাতায়” অবস্থান করতে হয় এবং সেখানেই ১৩২ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মদ জন্যগ্রহণ করেন।

শিক্ষাঃ মুহাম্মদ প্রধানত কূফাতেই শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। সে সময় কূফাই ছিল আরবী সাহিত্য, নাহ্, তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্ প্রভৃতির শিক্ষাকেন্দ্র। এদিকে ইমাম মুহাম্মাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হিল প্রকৃতিগত আর তার উদ্যমও ছিল অনন্য সাধারণ। অপরপক্ষে পিতার মৃত্যুকালে তার জন্য রেখে গিয়েছিলেন ত্রিশ হাজার দিরহাম। ইমাম মুহাম্মদ নিজের শিক্ষার জন্য এসব অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ আমি নাহ্ (আরবী গ্রামার) এবং সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য পনেরো হাজার দিরহাম ব্যয় করেছি। আর পনেরো হাজার দিরহাম ব্যয় করেছি হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য।

জ্ঞান-গরিমাঃ ইমাম মুহাম্মদ নিজের সুশিক্ষার জন্য পিতৃ-সম্পদের সবই ব্যয় করেছিলেন। তার প্রতিদানে তিনি পেয়েছিলেন জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার এমন অতুল-বৈভব, যা দুনিয়ার কম লোকের এমন জ্ঞান ঐশ্বর্যের, যার তুলনা মেলা ভার। ইমাম শাফেয়ী বলেনঃ “আমি ইমাম মুহাম্মাদের নিকট হতে এক উষ্ট্র বোঝাই পরিমাণ জ্ঞান লাভ করেছি। যদি তিনি আমাকে এভাবে জ্ঞানদান না করতেন, তবে আজ আমার জ্ঞান-চক্ষু যেভাবে উন্মীলন হয়েছে, তা কখনো হতো না।” বস্তুত, তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র এবং ব্যাকরণ শাস্ত্র-জ্ঞানের সকল বিভাগেই ইমাম মুহাম্মাদের ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ।

তাফসীরঃ কুরআন মজিদের প্রকৃত অর্থ ও যথাযতভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে ছিল। ইমাম শাফেয়ী বলেনঃ ইমাম মুহাম্মাদের চাইতে কিতাবুল্লাহর-এ অধিক জ্ঞানী কাউকে আমি দেখিনি। এমনি ধরনের এক মন্তব্য আবু ওবায়দ থেকেও পাওয়া যায়।

হাদীসঃ তিনি হাদীস শিক্ষা করেন মাসআর বিন কাদাম, সুফিয়ান সওরী, আরম ইবনুয যাররাহ, মালেক বিন মাগবেল, ইমাম মালেক বিন আনাস, আমর ইবনুল আওয়াযী, যামআত বিন সালেহ, বুকায়ের বিন আমের প্রমুখ শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদের নিকট। তবে বিশেষভাবে তিনি ইমাম মালেকের নিকট বেশীর ভাগ হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি নিজেই বলেছেনঃ 'আমি দীর্ঘ তিন বছর ইমাম মালেকের সাহচর্যে কাটিয়েছি এবং তার নিকট থেকে আমি সাতশ হাদীস শুনেছি।’

ছাত্রঃ ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্র সংখ্যাও ছিল অনেক। তার সাগরেদদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ ইমামের মর্যাদা পেয়েছেন। যথাঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ) প্রমুখ ।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞানঃ ধর্মের সকল বিভাগেই ইমাম মুহাম্মাদের ব্যুৎপত্তি ছিল গভীর। তবে বিশেষ করে তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন ইমামে আযম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম ইউসুফের ফিকাহর ছাত্র। জ্ঞানের গভীরতা, সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আর সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলে ইমাম মুহাম্মদকে যে কোন সময় যে কোনো কঠিন-থেকে কঠিনতর আর জটিল থেকে জটিলতর মাসআলা জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, তিনি তার স্বভাবজাত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা তাঁর অত্যন্ত সুন্দর জওয়াব দিতে পারতেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেনঃ 'আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি, যাকে যে কোন কঠিন মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তৎক্ষণাৎ তাঁর জওয়াব দিতে সক্ষম-একমাত্র ইমাম মুহাম্মদ ব্যতীত। ইমাম শাফেয়ী ফিকাহ্ শাস্ত্রের ইমাম মুহাম্মাদের গভীর জ্ঞান, মাসআলা দেওয়ার ব্যাপারে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং হালাল হারামের মাসআলা জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহুবার নানাভাবে প্রশংসা করেছেন। এমন কি তিনি এ পর্যন্ত বলেছেনঃ 'আমিত এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি, ফিকাহ্ শাস্ত্রে যার জ্ঞান ইমাম মুহাম্মাদের চাইতে বেশী।' ফিকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞানের মানদণ্ড বিচারের পক্ষে ইমাম শাফেয়ীর মন্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কাজেই ইমাম শাফেয়ীর মন্তব্য দৃষ্টেই ইমাম মুহাম্মাদের ফিকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিব্যাপ্ততা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। আবু উবায়দ বলেছেনঃ 'একদা আমি ইমাম মুহাম্মাদের নিকট গেলাম? দেখি ইমাম শাফেয়ী তার পাশে বসে আছেন। তিনি কোন একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ তার জওয়াব দিলে তিনি খুবই পছন্দ করলেন এবং তাৎক্ষণাৎ লিখে নিলেন।'

কাযির পদঃ ইমাম মুহাম্মাদের এরূপ জ্ঞান-গরিমা লক্ষ্য করেই খলীফা হারুন অর রশীদ তাঁকে রাষ্ট্রার (শহরের নাম) কাযীর পদ দান করেন। বেশ কিছুদিন তিনি অতি একনিষ্ঠভাবে কাযীর কাজ চালিয়ে যান। অতঃপর কোন কারণবশত অন্যায়ভাবে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।

বাগ্মিতাঃ মানুষের সকল জ্ঞান ও মানসিক প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দানের প্রধান অবলম্বন হল বাকশক্তি। যার বাকশক্তি অপটু এবং মধুর নয়, এমন বিপুল জ্ঞানবান ব্যক্তিরও কোণায় বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। ফলে তাদের জ্ঞান ঐশ্বর্য বাইরের আলো-বাতাস কমই দেখতে পায়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের বাকশক্তিও ছিল অপূর্ব আরবী ভাষার প্রায় প্রতিটি বিভাগেই তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্ প্রভৃতিতে তাঁর জ্ঞান ছিল যেমন সীমাহীন, অপরদিকে তেমনি তার বক্তৃতাও হত ফাসাহাত ও বালাগতের (সুনিপুণ ও অলঙ্কারে ভরপুর বক্তৃতা) সমন্বয়ে গভীর আকর্ষণীয়। ইমাম শাফেয়ী বলেনঃ "তিনি যখন কথা বলতেন, মনে হতো কুরআন তাঁরই" ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া, ইমাম মুহাম্মাদের বক্তৃতার মধ্যে থাকত বিপুল প্রাণোজ্জীবনী শক্তি। তিনি যখন কোন বিষয়ে বক্তৃতা করতেন, শ্রোতা সাধারণ তা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুধু শুনতোই না, বরং তা তাদের জীবনে বাস্তবায়িত করার প্রেরণাও পেতো।'

ইমাম মুহাম্মদ অতি অল্প বয়সেই গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। ফলে মাত্র বিশ বছর বয়সেই তিনি কুফার মসজিদে শিক্ষাদান শুরু করেন।

দৈহিক সৌন্দর্যঃ ভেতরের গুণাবলীতে যেমন তিনি বৈশিষ্টমন্ডিত ছিলেন, তেমনি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অনুপম দৈহিক সৌন্দর্য ও দান করেছিলেন। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গল্প বলা হয়ে থাকে। তিনি যখন অল্প বয়স্ক বালক, তখন একদা তার পিতা শিক্ষা ও দীক্ষাদানের জন্য ইমাম আযম আবু হানীফার নিকট

তাকে সংগে নিয়ে হাযির হন। ইমাম সাহেব তাঁর অনুপম রূপ-সুশমা দেখে তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ 'এর মাথা কামিয়ে দিন এবং মোটা ও ঢিলে-ঢালা কাপড় পরতে দিন-যাতে করে একে দেখে মানুষ কেলেঙ্কারীতে না পতিত হয়।' ইমাম মুহাম্মাদের পিতা তৎক্ষণাৎ তাঁর নির্দেশ পালন করেন। কিন্তু চাঁদ কি মেঘে ঢাকা থাকে? এতে তাঁর সৌন্দর্য ত ঢাকা পড়লই না, বরং আরো যেন তা চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

শিক্ষায় একাগ্রতাঃ জ্ঞান হাসিলের ব্যাপারে সুস্থ-চিত্ততা ও একাগ্রতা অতি প্রয়োজনীয়। আপনি যে কোন জ্ঞান হাসিল করতে চান না কেন, একাগ্রচিত্তে এবং একনিষ্ঠভাবে সাধনা না করলে কিছুই হাসিল করতে পারবেন না।

গ্রন্থ প্রণয়নঃ ইমাম মুহাম্মদ তাঁর সাংসারিক সকল কাজ-কর্ম এক ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পরিবার-পরিজনকে বলে দিয়েছিলেনঃ 'তোমাদের যার যা কিছু দরকার হয়, আমার এই ম্যানেজারের কাছে তা পাবে।' শিক্ষা সাধনা, শিক্ষাদান, ফতোয়াদান, কাযীর পদের কাজকর্ম-সব কিছু সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়ার পরও ইমাম মুহাম্মদ অনেক কয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর গ্রন্থগুলি আজও ইসলামী ফিকাহর ভিত্তি গ্রন্থ বলে বিবেচিত। ইমাম মুহাম্মাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির নাম হলঃ আল-মবসুত, আল-জামেয়ুসসাগীর, আলজামেয়ুল কাবীর, আযযীয়াদাত প্রভৃতি উসুলের গ্রন্থ এবং আররাকীয়াত, আলহারে দীনীয়াত, আলকিসানীয়াত, আলজুরজানীয়াত প্রভৃতি ফিকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব, আর হাদীসে "কিতাবুল আসার" এবং 'মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ'।

ইমাম মুহাম্মদের গ্রন্থগুলি এত জনপ্রিয় এবং উপাদেয় ছিল যে, তাঁর গ্রন্থের জন্য সমগ্র দেশবাসী গর্ববোধ করতো। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বলকে কোন এক ব্যক্তি একদা জিজ্ঞাসা করলেনঃ এমন সুস্মৃতিসুস্ম মাসআলাগুলি আপনি কোথা থেকে জানতে পারেন? জওয়াবে তিনি বলেছিলেনঃ "মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের কিতাব থেকে।"

ইমাম শাফেয়ী বলেন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আমার কাছে সর্বদাই অতি মর্যাদার অধিকারী। আমি তাঁরই কিতাবের জন্য ষাট দিনার খরচ করেছি।

মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধঃ খলীফা হারুন-অর-রশীদদের দরবারে ইমাম মুহাম্মদ মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন সত্য; কিন্তু কখনো নিজের ব্যক্তিত্বে বা মর্যাদায় সামান্যতমও আঁচড় লাগতে দেননি। আবু উবায়দ বলেছেনঃ "একদা আমরা সবাই ইমাম মুহাম্মদের কাছে বসে আছি। এমন সময় হারুন-অর-রশীদ সেখানে আগমন করলেন। তাঁর সম্মানার্থে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু ইমাম যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে থাকলেন। তারপর এক এক করে আমরা সবাই খলীফার নিকটে গমন করলাম এবং কথাবার্তা বললাম।

এর পর ইমাম সাহেবের পালা এলে খলীফা বললেনঃ আমার সম্মানার্থে সকলেই দাড়িয়ে গেল, কিন্তু আপনি ত দাড়ালেন না। তিনি জওয়াব দিলেনঃ আপনি আমাকে যে মর্যাদা-সম্পন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন- আমি চাই না যে, আমি পুনরায় সেই দলের বাইরে চলে আসি। আপনি আমাকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত করে থাকেন। আমি চাই না যে, সেই স্তর থেকে নেমে এসে কর্মচারী ও সাধারণ চাকরদের মধ্যে পরিগণিত হই। হযরত (সাঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি চায় যে, মানুষ তার সম্মানার্থে দাড়িয়ে যাক, সে যেন তার স্থান দোষে করে নেয়।' এখানে মানুষ অর্থে হযরত (সাঃ) আলিমদের কথাই বলেছেন। যারা খেদমতের কর্তব্যের খাতিরে এবং বাদশাহর সম্মানার্থে দাড়ায়, তাদের দ্বারা দুশমনের জন্য ভীতির সঞ্চার এবং পরাক্রমশীলতার পরিচয় প্রকাশিত হয়; আর যারা বসে থাকে, তারা করে সুন্নতের তাবেদারী যে সুন্নত আজ

তোমাদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত-প্রায়। সুতরাং (যারা বলে থাকে) এ জাতীয় লোকত তোমাদের জন্য গর্বের বস্তু এবং তোমার দরবারের সৌন্দর্য বর্ধনকারী। একথা শুনে, হারুন বললেনঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

এইভাবে আলোচনার পর হারুন প্রশ্ন করলেনঃ হযরত উমর (রাঃ) বনি তাগলারের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন যে, তারা তাদের সন্তানদিগকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিবে না। কিন্তু তারা সে শর্ত পালন করতে পারেনি। বরং তারা তাদের সন্তানদিগকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছে। সুতরাং এখন সন্ধি ভঙ্গ করার জন্য কি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নয় কি? ইমাম মুহাম্মদ জওয়াব দিলেনঃ

বনি তাগলার হযরত উমর (রাঃ)-এর পরে তাদের সন্তান-সন্ততিকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) তা সহ্য করে গেছেন। তিনি ত আপনার 'ইবনে আম' (চাচার বংশের) ছিলেন। অথচ একথাত অতি স্পষ্ট যে, যে ইলম তাঁর কাছে ছিল, তা আপনার কাছে নাই। তা সত্ত্বেও সেই সন্ধি অনুযায়ীই কাজকর্ম চলে আসছে অর্থাৎ হযরত উমরের (রাঃ) পরেও পরবর্তী খলীফাগণ সেই সন্ধিই বহাল রেখেছেন। সুতরাং আপনি যদি এখন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে সে জন্য আপনার কোনরূপ জওয়াবদিহি হতে পারেনা।

অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ বললেনঃ আমার নিকট যা সত্য বলে মনে হয়েছে, তাই-ই আমি পেশ করলাম। এরপর আপনার যা অভিমত হয়, তাই-ই ভাল মনে করি। হারুন তাঁর এই যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যমূলক ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। অতঃপর বললেনঃ না, না! আমার পূর্ববর্তিগণ যা করে গেছেন, আমি তাই-ই অনুসরণ করব। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে তাঁর সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তা সত্ত্বেও যখন কোন কঠিন বিষয় উপস্থিত হত, তখন জিব্রাইল (আঃ) তার সমাধান বলে দেওয়ার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে আগমন করতেন। আপনি 'শুধু তার (আমার) জন্যদোয়া করুন-যার দুর্বল কাঁধে হুকুমতের ন্যায় বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজেও দোয়া করবেন এবং আপনার সঙ্গীদেরও দোয়া করতে বলবেন। অতঃপর হারুন পুনরায় তাকে বললেনঃ আমি আপনাদের জন্য কিছু দানের নির্দেশ দিয়েছি। আপনি (অনুগ্রহ করে) তা গ্রহণ করুন এবং আপনার সাথীদের মধ্যে বিতরণ করে দিন। অতঃপর ইমাম মুহাম্মদকে বিপুল পরিমাণ মালমাত্তা দেওয়া হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলো তার সাথীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

বদান্যতাঃ ইমাম মুহাম্মদ খুব শান-শওকতের সঙ্গে দিন গোযরান করতেন। তবে তিনি বড্ড: দানশীলও ছিলেন। বিশেষ করে আলিম এবং তালিবুল ইলমদের জন্য ব্যয় করতেন একেবারে বিনা হিসাবে।

ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব

ইবনে ইমাম হাম্বলী লিখেছেনঃ 'ইমাম মুহাম্মদ ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গে অতি ভাল ব্যবহার করতেন। তিনি তার প্রয়োজনে সাহায্য করতেন, দরকার হলে কোন কাজ করে দিতেন, পুস্তকাদি ধার দিতেন। এমন কি, বলা হয়ে থাকে যে, এক উষ্ট্রের বোঝা কিতাব তিনি ইমাম শাফেয়ীকে দান করেছিলেন।'

ইমাম মুহাম্মদের সঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর নিগূঢ় সম্বন্ধ এবং গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে শাফেয়ী মতাবলম্বীদের এক অংশ মনে করেন যে, ইমাম মুহাম্মদ হারুন-অর-রশীদের নিকট ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে কিছু লাগিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা দৃষ্টে তা কিছুতেই প্রমানীত হয় না। ইবনে ইমাম হাম্বলী বলেন যে,

তিনি যে ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে হারুনকে উচ্ছানি দেননি, শুধু তাই নয়, বরং তিনি তার জীবনই রক্ষা করেছেন। ঘটনাটি এইরূপঃ

একবার হারুনের নিকট রিপোর্ট এল যে, হযরত আলীর বংশধরদের দশ ব্যক্তি খিলাফতের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করছে এবং তারা হারুনকে ন্যায়ানুগ খলীফা বলে স্বীকার করছেন। এ সংবাদ শুনে হারুন তাদের গ্রেফতার করার আদেশ দেন। বস্তুত তাদের গ্রেফতার করে রাক্ষা থেকে বাগদাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই দশ জনের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীও ছিলেন। ইতিমধ্যে হারুন কোন কার্যোপলক্ষে বাগদাদ থেকে রাক্ষা গমন করেন। তাই বন্দীদেরকে পুনরায় রাক্ষা পাঠানো হয়। এ সময় ইমাম মুহাম্মদ রাক্ষার কাযীর পদে সমাসীন ছিলেন। তাদেরকে যখন খলীফার সামনে হাযির করা হয়, তখন তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, বন্দীদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীও আছেন, তখন তিনি মর্মান্বিত হলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছু করা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বিচার শুরু হয়ে গেল। এক একজন বন্দীকে খলিফার সামনে হাযির করা হলো আর তিনি প্রত্যেককে দু'একটি প্রশ্ন করে কতলের নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। এইভাবে ইমাম শাফেয়ীর পালা এল। তাঁকে খলীফার সামনে হাযির করা হলো। হারুন যথারীতি তাঁকেও প্রশ্ন করলেনঃ আপনি কি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন? ইমাম সাহেব জওয়াব দিলেনঃ না, কিছুতেই নয়। আমি তালেবী ও আবু হারিবের বংশধর নই, কিংবা উলুবীও (আলীর বংশধর) নই।

খামোখা আমাকে এদের সাথে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আমি বনি আব্দুল মুত্তালিব বিন আবদ মানাফের এক বংশধর, আর আমার কাজ হল, কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্র নিয়ে মশগুল থাকা। এই যে কাযী (ইমাম মুহাম্মদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক্রমে) আপনার পাশে বসে আছেন, তিনিও তা খুব ভালোভাবেই জানেন। হারুন অর-রশীদ বললেনঃ আচ্ছা, তবে আপনিই মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ্ শাফেয়ী? তিনি জওয়াব দিলেনঃ জী, হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন। অতঃপর হারুন ইমাম মুহাম্মদের প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইনি যা কিছু বলছেন, তা সত্য না কি? ইমাম মুহাম্মদ বললেন, জী, হ্যাঁ! ইনি যা বলছেন, সবই সত্য। বরং তিনি এর চাইতেও উচ্চ মর্যবীর জ্ঞানবান। খলীফা এসব শুনে বললেনঃ আচ্ছা, তবে ঐঁকে আপনার হাতেই সমপর্ণ করা গেল।

ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেনঃ অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ আমাকে নিজের জিন্মায় নিয়ে নিলেন এবং তারই চেষ্টায় মুক্তিলাভ করি।

ইবনে ইমাম হাম্বলী এই পুরো ঘটনাটি আল্লামা ইবনে আব্দুল বার থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং এই মন্তব্য করে শেষ করেছেনঃ

‘কিয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রতিটি শাফেয়ী মতাবলম্বীর ইমাম মুহাম্মদের এই অনুগ্রহের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর জন্য সর্বদা দোওয়া করা কর্তব্য।’

ওফাতঃ ইমাম মুহাম্মদ হিজরী ১৮৯ সালে ‘র’ নামক শহরে ইন্তেকাল করেন। ঘটনাক্রমে এই একই দিন নাহ্ (আরবী ব্যাকরণ) শাস্ত্রের মস্ত বড় ইমাম কাসয়ীও ইন্তেকাল করেন। হারুন-অর-রশীদ ঐঁদের মৃত্যু সংবাদ শুনে বলেছিলেনঃ “আজ নাহ্ ও ফিকাহ্ উভয় শাস্ত্রই কবরে চলে গেলো।” কবি ইয়াযীদী উভয়ের মৃত্যুতে শোকাভূর হয়ে এক দীর্ঘ মর্সিয়া লিখেছিলেন।

=====